OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 945 - 950*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# অচর্চিত বাণী রায়

অধ্যাপক ড. আশীষ কুমার সাউ
বাংলা বিভাগ, এম. আর. এম. কলেজ
ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়
দ্বারভাঙ্গা, বিহার
Email ID : asishksau88@gmail.com

***Received Date** 20. 12. 2024*
***Selection Date** 01. 02. 2025*

***Keyword***
*অন্তঃসলীলা ফল্গু, প্রতিপত্তিশালী, শেরিফ, অধিকারসচেতন, ডাইরেক্ট মেথড।*

***Abstract***
বাংলা ভাষা জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত বাংলার সাহিত্যাকাশে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভাধর সাহিত্যিক। সাহিত্যের এই দীর্ঘ যাত্রাপথের পথিক কেবলমাত্র পুরুষই নন, মহিলা সাহিত্যিকের লেখনিও এই যাত্রা পথকে ভাস্বর করেছে। এই রকম এক তেজস্বী মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন বাণী রায়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে তাঁর বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতি মননধর্মিতা, স্বাধীন মুক্তপ্রেম ও প্রতিবাদী সত্তা সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, অনুবাদমূলক রচনা প্রভৃতি নানাবিধ রচনাগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় নিহিত। তাঁর বহুমুখী, বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দানের প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে।

## Discussion

বাংলা সাহিত্য-স্রোতের ধারায় বাণী রায়ের সাহিত্যকৃতি অন্তঃসলীলা ফল্গুর মতো প্রবহমান, যার রসধারা বাংলার অগণিত পাঠকের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে। বাণী রায়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তাভাবনার মৌলিকতা, নির্মোহ দৃষ্টি এবং তথা অপরিমেয় সাহসিকতা তাঁর রচনাগুলিকে যে অভিনবত্ব দিয়েছিল তার স্বাদগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তাঁর সময়কালের সকল রসজ্ঞ পাঠকের। ফলে বাণী রায়ের সমসাময়িক অনেক দুর্বল লেখক লেখিকা বাংলা সাহিত্যে তাঁর তুলনায় অধিক পরিচিতি লাভ করলেও এই লেখিকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অপাংক্তেয়। তবে আজকের পাঠককুলের কাছে বাণী রায়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বাণী রায়ের জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ আছে। একটি তারিখ হল ৫ নভেম্বর, ১৯১৮ আর অন্য মতে ৫ নভেম্বর, ১৯২০। বাণী রায়ের জন্ম সাল ১৯১৮, এই তথ্য মেলে 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' গ্রন্থে। আর এক মতে বাণী রায়ের জন্ম সাল হল ১৯২০ এর প্রমাণ মেলে তাঁর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির ভূমিকার মধ্যে। আবার বাণী রায়ের ভাইপো ড. অনিরুদ্ধ রায়ের (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক) মতেও ১৯২০ সালটাই বাণী রায়ের প্রকৃত জন্মসাল। সম্ভবত এই কারণে, বাণী রায় নিজেই বলেছেন, -

> "আমার জন্মের সন, তারিখ, বার পর্যন্ত নিয়ে গোলমাল আছে। ইংরাজি ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১ এই তিনটির মধ্যে কোনো একটি হয়তো হতে পারে।"[১]

মোটামুটিভাবে বাণী রায়ের জন্মসাল ১৯২০ খ্রিঃ মেনে নিতে পারি। তাঁর জন্মস্থান উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার হাটুরিয়া অঞ্চলের পেঁচাখোলা গ্রামে। তাঁর পিতামহের নাম ছিল উমেশচন্দ্র রায় ও পিতার নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র রায়। তাঁর প্রপিতামহ শম্ভুনারায়ণ বা শম্ভুনাথ রায় ছিলেন পাবনা জেলায় প্রতিপত্তিশালী জমিদার। শোনা যায় তাঁর জমিদারির সময় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো, এমনি কঠোর বা রাশভারি জমিদার ছিলেন তিনি। বংশ পরম্পরায় সেই ঐতিহ্য লোপ পেতে থাকে এবং জমিদারিও ক্রমেই বিলীন হতে থাকে। বাণী রায়ের পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় (এম.এ.বি.এল.) ছিলেন উত্তরবঙ্গের জমিদার। তবে তিনি জমিদার পরিচয়ের তুলনায় গ্রামের সবার কাছে অ্যাডভোকেট হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জমিদারি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং অ্যাডভোকেটের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি এই জীবিকায় নিযুক্ত ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ওকালতি ত্যাগ করে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি 'হিন্দু মিউচুয়াল ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সারা জীবন খদ্দর পরেছেন, কখনো বিদেশি জিনিস ব্যবহার করেননি। তিনি যেন এই বাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন - 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'। তিনি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রাজেন্দ্র প্রসাদের সহপাঠীরূপে একঘরে বাস করেছেন। পূর্ণচন্দ্র রায় মনে প্রাণে স্বদেশি ছিলেন। উমেশচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন পূর্ণচন্দ্র রায়। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বাণী রায়ের মা হলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক গিরিবালা দেবী। তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিলেন 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটি রচনা করে। এছাড়া তাঁর আরো অনেক বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে, 'কুড়ানো মানিক', 'করবী-মল্লিকা', 'তৃণগুচ্ছ', 'হিন্দুর মেয়ে', 'দান প্রতিদান', 'রূপহীনা' প্রভৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। পূর্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র রায় হাটুরিয়াতেই থেকে যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র রায় কলকাতার শেরিফ ছিলেন। বাণী রায় ছিলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। পূর্ণচন্দ্র ও গিরিবালা দেবীর দুই পুত্র ও এক কন্যা, যথাক্রমে সুশীল রায়, অনিল রায় ও বাণী রায়। বাণী রায়ের দুই দাদা উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদাসীন ছিলেন। বেহালার বিবেকানন্দ কলেজটি সুশীলকুমার রায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

প্রথম দিকে কলকাতায় এসে তাঁরা উত্তর কলকাতা অঞ্চলে ঠন্‌ঠনিয়া কালী বাড়ির কাছে বাসা বাড়িতে ছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯৩০-৩১) নিজস্ব বিশাল বাসভবন 'বাণী মন্দির'-এ বসবাস করতে থাকেন। কথিত আছে, পিতা পূর্ণচন্দ্র তাঁর একমাত্র কন্যাকে খুব বেশি ভালবাসতেন, তাই কন্যার নামে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বাণী রায়ের জীবনের বেশির ভাগ সময়টা কেটেছে ঐ বাড়িতে। ঐ বাড়িটির ঠিকনা ছিল ৭৩ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। এই বাড়িতে ঘরের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটি, গাড়িও ছিল একাধিক প্রায় তিন-চারটি। বাণী রায়ের জীবনের শেষ পর্বে (১৯৮৬) তাঁদের উত্তরপুরুষের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ ঘটায় বাণী দক্ষিণ কলকাতার ত্রিকোণ পার্কের সন্নিকটে একটি বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এবং সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন।

বাংলাদেশের পাবনা অঞ্চলে বাণী রায়ের শৈশব কালের পাঁচ-ছয় বছর কেটেছিল। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁরা মাঝে মাঝে পাবনায় গেছেন। পাবনা অঞ্চলে জমিদার বাড়ির মেয়ে হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতাপ ছিল সর্বত্র। শৈশব থেকেই তিনি অবাধে ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন। বাড়ির একমাত্র কন্যা সন্তান হওয়ায় সকলের আদরের ধন ছিলেন বাণী রায়। তাই জীবনে কখনো দুঃসাহসিক কাজ করতে পশ্চাৎপদ হতেন না তিনি। গ্রাম বাংলার ভাষায় তিনি ডাকাবুকো মেয়ে হিসাবে পরিচিত ছিলেন। যা তাঁর পরিণত বয়সের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। আর ছোটবেলায় পাবনা অঞ্চলে বসবাস করায় তাঁর সাহিত্যে পাবনা অঞ্চলের কাহিনি ও ভাষা স্থান পেয়েছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'একটি মেয়ে জন্ম নিলো' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির চিন্তা চেতনায় নবজাগরণের প্রভাব নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। যে সমস্ত কুপ্রথা মেয়েদের স্বাভাবিক গতি রোধ করে চার দেওয়ালের অন্ধকূপে বন্দী করে রেখেছিল, তার থেকে মুক্ত হল মেয়েরা। নতুনভাবে বাঁচার আশা দেখলো। লেখাপড়ার সুযোগ পেল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীর এই বিবর্তন পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাদের আগমন ঘটেছে বটে কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মহিলা সাহিত্যিকগণও

নারীর চিরকালের কন্যা-জায়া-জননী রূপের বাইরে নারীমনের চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনার চিত্র অঙ্কনে সাহস বা সক্ষমতা দেখাননি। বাণী রায়ই সাহিত্যাকাশে ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সমাজের নীতি, প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার উর্ধ্বে মেয়েদের স্বাধীন সত্তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। ফলে তাঁকে যথোচিত মূল্যও দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের একটি রচনা স্মরণযোগ্য–

> "দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল - পালের গরু হতে তিনি চাননি। তার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ...ঐ দুঃসাহসী কলমের যে পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল, যে পরিমাণ সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করা উচিত ছিল, তা ঘটেনি। ...নারী জন্মের মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। আমাদের দেশ এখনো তেমন উদার হয়নি, তখন তো একেবারেই ছিল না।"[২]

বাণী রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যেমন স্বতন্ত্র ছিলেন তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। আর মহিলা হয়েও মহিলাজনোচিত লজ্জা, সংকোচ, ব্রীড়ার পরিবর্তে পুরুষের ন্যায় দীপ্ত, উন্নত ঋজুতা তাঁকে মহিলা সমাজ তো বটেই পুরুষ সমাজেও ব্রাত্য করে রেখেছিল। আর এরই প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও।

বাণী রায়ের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের দিকে আলোকপাত করলে তাঁর বহুব্যাপ্ত, বিচিত্র সাহিত্যপ্রতিভা আমাদের বিস্মিত করে। সাহিত্যের নানা বিভাগে ছিল তাঁর অবাধ পদচারণা। তিনি সব্যসাচীর মতো একদিকে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, রম্যরচনা করেছেন আবার অন্যদিকে সাহিত্য-সমালোচনা, পত্রিকা-সম্পাদনা, শিশুসাহিত্য সৃষ্টি, বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

মাত্র সাত বছর বয়সে সাহিত্য-সাধনায় হাতেখড়ি বাণী রায়ের। এই সাধনা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর আগে পর্যন্ত। তাঁর সাহিত্য রচনা আরম্ভ কবিতা দিয়ে। কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষিত হয় তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মাত্র এগারো বছর বয়সে 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। নানা পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার কাব্যমূল্য বিচার করে দেখলে হয়তো বা তার সবগুলিকে অতি উচ্চমানের কবিতা বলা যাবে না, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতিতে তাঁর কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী হয়েছে অনেক সময়। বাণী রায়ের 'জুপিটার' কাব্যগ্রন্থের কবিতা প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য –

> "এই কবিতাগুলি বাঙালি পাঠককে কিছু নতুন আস্বাদ দেবে প্রধানতঃ দুই কারণে। কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে একটা ঋজু দৃঢ়তা আছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা পুরুষের নয়, নারীর। ...মুখের পর্দা ঘুচানো সহজ, মনের পর্দা তোলা কঠিন কাজ। নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টির অবিকৃত প্রকাশ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। কিন্তু সে সাহস কেবল শক্তিশালী লেখকদেরই থাকে। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। চেষ্টাকৃত বিদ্রোহের উৎসাহে নয়, সহজ স্বাভাবিকতায়।"[৩]

'জুপিটার' বাণী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে বাণী রায় নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কাব্যমাধ্যমে। বিদেশি সাহিত্যে সুপন্ডিত কবি তাঁর কাব্যে গ্রীক ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন। তবে কবির অনুভূতির জাদুস্পর্শে বিদেশি সাহিত্য একেবারে বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। তার বিদেশিয়ানা হারিয়ে বিদেশি সাহিত্যকে দেশি পাত্রে পরিবেশন করেছেন কবি বাণী রায়। উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের অপরূপ ব্যবহারে তাঁর কবিতাগুলি অসাধারণত্ব লাভ করেছে। 'অরণ্যমর্মর' কাব্যগ্রন্থে বাংলা সনেট সৃষ্টিতে বাণী রায়ের দক্ষতার পরিচয় মেলে। অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে গভীর আত্মিক বন্ধন, যে বন্ধন যান্ত্রিকতার কলুষ অনেকখানি আলগা করে দিয়ে মানুষকে অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত করছে, তাকে এই কাব্যগ্রন্থে রূপায়িত করেছেন কবি। বাণী রায়ের কবিতাগুলি প্রকাশের বিচিত্রতায়, আঙ্গিকের বিশিষ্টতায়, বিষয় বৈচিত্র্যে, অলঙ্কার-ভাষা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে ও কবিহৃদয়ের একান্ত আন্তরিক অনুভূতির দীপ্ত প্রকাশে অনেক সময়েই অসাধারণ ও অনন্য।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাণী রায়ের অনায়াস গমন থাকলেও তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যের জন্য। বিশেষ করে বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রচনারীতিতে অভিনব ছোটগল্পগুলি বাণী রায়ের সাহিত্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর ছোটগল্পের প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য –

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 106
Website: https://tirj.org.in, Page No. 945 - 950
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের এমন একটি সহজ প্রত্যয় ছিল, যা অনায়াসেই চিনিয়ে দিয়েছিল যে তিনি কারো প্রতিধ্বনি নন–নজির মিলিয়ে অভ্যস্ত পথে পা টিপে টিপে সতর্কভাবে চলা তাঁর স্বভাব নয়। জীবনের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, নীতিকথা ও চিরাচরিত সংস্কার যেখানে সত্যকে বিভ্রান্ত করে, আদর্শের নামে যেখানে জীবনের পায়ে জড়তার শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হয়, শ্রীমতী বাণী রায় তার সঙ্গে কোনদিন আপোষ করতে পারেননি। শুধু আপোষ করেননি বললেও সবটুকু বলা হবে না – তিনি তার শতসংস্কারে আবদ্ধ প্রাচীন দুর্গদ্বারে আঘাত হেনেছেন।"[৪]

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে দ্রুত বদলে যাওয়া বাঙালি সমাজের চিত্র বাণী রায় তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে পরিবারের প্রয়োজনে মেয়েদের অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোকিত রাজপথে পা রাখা থেকে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সূচনা তাকে লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। এই মেয়েরা সংসারে নিবেদিতপ্রাণা, আত্মবিলোপী নারীই শুধু নয়, এরা অধিকারসচেতন, ভোগবাসনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিসত্তা রূপে আত্মপ্রকাশিত। বাণী রায় শুধু মেয়েদের চরিত্রের মহানুভবতা, পরার্থপরতা, কর্মকুশলতা, স্নেহশীলতাকে উপস্থাপিত করেননি, পাশাপাশি তিনি ক্রূরতা, কঠোরতা, হিংসা, স্বার্থপরতা, নীচতাকেও তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গ্রামের অর্থনৈতিক সংকট এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতা এবং চাষ-আবাদের তুলনায় চাকুরী গ্রহণের প্রবণতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন লেখিকা। তাঁর উপন্যাস 'সুন্দরী মঞ্জুলেখা', 'সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি' প্রভৃতিতে এই গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব তথা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতা লক্ষণীয়।

সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাকে লেখিকা তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরে সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। মনোজগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বাঙ্ময় রূপ দেওয়া তাঁর মূল লক্ষ্য হলেও তিনি সমাজ-বিমুখ ছিলেন না। তাই অর্থনৈতিক নানা সমস্যা যেমন জমিদারী প্রথার লোপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়া, কৃষিতে অসাফল্যের কারণে চাকুরী গ্রহণের প্রবণতা, বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত সমাজের চরম অর্থনৈতিক অবক্ষয় তথা মানসিক অবক্ষয় সমস্ত কিছুকে বাণী রায় তাঁর কথাসাহিত্যে রূপদান করেছেন। আবার ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, হত্যা, রাহাজানি, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, সমকামিতা, কুমারী মাতৃত্ব, চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিকেও পাঠকের সামনে তুলে ধরে সমস্যা-সমাধানে প্রয়াসশীল হয়েছেন।

বাণী রায়ের পূর্ববর্তী ও সমকালীন মহিলা কথাসাহিত্যিকদের লেখনীতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই দেখা গেছে। মেয়েদের দুঃখ-যন্ত্রণা, হতাশা-অভিমান, কামনা-বাসনাকে সাহিত্যে রূপায়িত করলেও মেয়েদের প্রতি এঁরা পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। তাই নারী চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বল দিকগুলি এঁদের লেখনীতে তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বাণী রায় এই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিলেন না। তিনি যেমন নারীচরিত্রের গুণগুলি প্রকাশ করেছেন তেমনি দোষগুলোকেও কখনো আবৃত করার চেষ্টা করেননি। এখানেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তিনি স্বতন্ত্র।

উপন্যাস বা কবিতার তুলনায় ছোটগল্পে বাণী রায়ের অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বিচরণ। রোমান্টিক, কল্পনাপ্রবণ এই লেখিকার রূপের প্রতি সহজাত অনুরাগ তাঁর গল্পের নায়িকাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর গল্পের নায়িকারা বাংলা কথাসাহিত্যে একেবারে নতুন। তিনি কল্পনার তুলনায় বাস্তবকে বেশি জোর দিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ, কন্যা-জায়া-জননীর ভূমিকায় নারীমনের প্রত্যাশার পূরণ ও ঘাটতি, সমকামিতা, সাধারণ স্কুলশিক্ষয়িত্রীর জীবনের চরম লাঞ্ছনা, প্রৌঢ়া জীবনের একাকিত্বের যন্ত্রণা, বিধবা মহিলার আদিম প্রেম, বন্যপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষিতা-নারীর বন্য প্রেম, আধুনিক মননশীলতা চরম একাকিত্বের দোসর, বিদেশের মাটিতে প্রেমের স্বরূপ, অত্যাচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্রমুখী গল্পে নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার তাঁর কিছু কিছু গল্প নিতান্তই সাধারণ, পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, গরীব-বড়োলোক ভেদাভেদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতা প্রভৃতিকে গল্পে রূপ দিয়েছেন লেখিকা।

প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে তাঁর গল্পে শিল্পসৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন লেখিকা। কোথাও আদিমপ্রেম, কোথাও চটুলতা, সম্ভোগের চিত্র, আবার কোথাও নিষ্কলুষ স্বর্গীয় শাশ্বত প্রেম তাঁর গল্পগুলিকে অসামান্যতা দান করেছে।

বাণী রায় গল্পের টেকনিক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। টেকনিকের বৈচিত্র্য তাঁর গল্পগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। গল্পরচনার ক্ষেত্রে 'ডাইরেক্ট মেথডের' তুলনায় তিনি আত্মজীবনীমূলক রীতি বেশি ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও দুটি রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাণী রায়ের গল্পের ভাষার বৈশিষ্ট্য পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে, অলঙ্কার-উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে, বিদেশি সাহিত্যের অনুসঙ্গ ব্যবহারে, বর্ণনাভঙ্গির মাধুর্যে তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাট্যক্ষেত্রে বাণী রায়ের খুব বেশি আনাগোনা না থাকলেও তিনি প্রধানত তিনটি নাটক রচনা করেছেন। এবং এই কয়েকটি নাটকই তাঁর নাট্যরচনার কুশলতার পরিচয় বাহক। তিনি ট্রাজেডি নির্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি বাণী রায়ের সুতীব্র অনুরাগের কারণে তিনি গ্রীক নাটক আত্মস্থ করেছিলেন। আর তার প্রভাবেই তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি নাটক তিনটি ভিন্ন বিষয়ের উপর আধারিত। পৌরাণিক কাহিনিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উপাস্থাপন করার মুন্সিয়ানা যেমন তিনি দেখিয়েছেন তেমনি সমাজের বুকে অপাংক্তেয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনার শিকার একটি মেয়ের জীবনের সব হারানোর মর্মস্পর্শী কাহিনিকেও তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন। আবার কালো মেয়ের বিয়েকে ঘিরে সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা তাকেও উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার বাণী রায়।

প্রাবন্ধিক বাণী রায় নিজের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। যদিও বিষয় নির্ভর প্রবন্ধ তিনি খুব বেশি লেখননি, বেশিরভাগ প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আর সেখানেও প্রাবন্ধিক বাণী রায় তাঁর নিজস্ব সাক্ষর রেখেছেন। তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ'-কে বাণী রায় নিজেই ফরমায়েসি রচনা বলেছেন। তাঁর নিজের কথায় –

> "Profiles জাতীয় রচনার প্রয়াস করেছি। ...Profile মানে পাশ থেকে মুখের সীমনা রেখা দেখা, সম্পূর্ণ দর্শন নয়। ...সাহিত্য বিচারে আমি সাহিত্যিককে জড়িত করে প্রোফাইলের প্রথায় নূতন আঙ্গিক বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছি।"[৫]

ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে দেখা বিখ্যাত ব্যক্তিদের খ্যাতির আড়ালে থেকে যাওয়া ব্যক্তিমনের চরিত্র-চিত্রণের ছবি এঁকেছেন বাণী রায়, তাঁর রচিত জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, মোহিতলাল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সম্পর্কিত প্রবন্ধে। আবার কিছু প্রবন্ধ নির্মাণে তিনি তাঁর পান্ডিত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি একদিকে যেমন তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয়বাহী, তেমনি তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতারও পরিচয় বহন করে। 'মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা' নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থটি মধুসূদন দত্তকে যেমন নতুন করে চেনায় তেমনি বাণী রায়ের প্রাবন্ধিক সত্তাকেও উন্মোচিত করে।

ছোটোদের সঙ্গে বাণী রায়ের আত্মিক নিবিড়তা ছিল। তিনি শিশুদের সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করতেন। তাঁর বাড়ির কচি-কাঁচাদের কাছে তিনি ভীষণ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কিশোর উপন্যাসগুলি 'হাসিকান্নার দিন', 'সেই চেনা ছেলেটি' কিশোর মনের সারল্য, মায়া, মমতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। যা প্রমাণ করে বাণী রায় নিজের অন্তরেই একটা শিশুমনকে তাঁর পান্ডিত্য, জ্ঞান, বুদ্ধির অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে রচিত বাণী রায়ের রম্যরচনা 'চক্রবক্র' তাঁর সাহিত্য প্রতিভার আর এক দিককে উন্মোচিত করে। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন তাতে বাণী রায়ের কৌতুক প্রবণতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি হাল্কাচালে গম্ভীর বিষয় পরিবেশনের মুন্সিয়ানাও ধরা পড়েছে। 'কলেজ স্ট্রীট', 'পুরনো কলকাতা' প্রভৃতি রচনাগুলি পাঠককে নষ্টালজিক করে তোলে। আবার 'অথ বিবাহ ঘটিত', 'বিনে ভোজে নিমন্ত্রণ', 'অতিথি', 'চা-কফি-সুগার' প্রভৃতি রচনাগুলির সরসতা পাঠককে মুগ্ধ করে।

বিদগ্ধা বাণী রায় শুধু নিজে বিদেশি সাহিত্য অধ্যায়নই করেননি, তিনি বাংলায় সফল অনুবাদও করেছেন। অনুবাদক বাণী রায় বিদেশি সাহিত্যিকে আত্মস্থ করে বাংলায় তা অনুবাদ করেছেন এমনভাবে যে তা আর বিদেশি থাকেনি, সম্পূর্ণরূপে বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বাণী রায় বিশিষ্ট। কয়েকজন লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাস-কবিতা সংকলন করে সম্পাদনা করেছেন তিনি। বিশেষত তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের রচনাসৌকর্য পাঠকের সামনে উপাস্থাপন। একেবারে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমকালীন মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত অনেকের রচনাকেই তিনি তাঁর গ্রন্থ সংকলনে স্থান দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাণী রায়কে হয়তো খুব সামান্য জায়গা দেওয়া হয়েছে, হয়তো তাঁর রচনাগুলি তাঁকে সুবিখ্যাত লেখকের পাশে জায়গা দেয়নি, তবুও তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও বুদ্ধিমত্তায় একমেবাদ্বিতীয়ম ছিলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা তাঁকে সবার মধ্য থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজের ক্ষমতায় সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন, কখনো কারো অনুকম্পার প্রত্যাশা করেননি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান এই অনন্য লেখিকা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের স্বাতন্ত্র্যে বাংলা সাহিত্যে নিজের পৃথক একটি স্থান অধিকার করেছেন। বাণী রায় ক্রমেই রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আরও বেশি করে আকর্ষণ করছেন এবং তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন নতুন করে করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। বাণী রায় যে নিজের যুগের অগ্রবর্তিনী সাহিত্যিক ছিলেন সে বিষয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই।

যাইহোক, বাণী রায় ‘আমার সাহিত্য জীবন’ নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ২৮ জুলাই, শুক্রবার, ১৯৬১ সালের ‘বেতার জগৎ’ - এ। যেটি কলকাতা আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সেখানে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন,-

> “আমার মনের মত রচনা আমি আজও লিখতে পারিনি। আমার সাহিত্য–সৃজনে আমি প্রীত নয়, আমি পূর্ণ নয়। মৃত্যুর পূর্বে যদি একটিও মনোমত সৃষ্টি রেখে যেতে পারি, আমি ধন্য হবো। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি সাহিত্যিক হয়েছি।”[৬]

যাইহোক, বাণী রায়ের শেষ জীবন সুখের ছিল না। শেষ জীবনের তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। আর পারিবারিক গোলযোগে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর সাধের ‘বাণী মন্দির’ ও বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। এর পর তিনি দক্ষিণ কলকাতায় ত্রিকোণ পার্কের কাছে একটি ফ্ল্যাটে চলে আসে এবং এখানেই আমৃত্যু কাটান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬ অক্টোবর, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে, পূর্ণদাস রোডের উপর শ্রীকৃষ্ণ নাসিংহোম নামে একটি স্থানীয় নাসিং হোমে। তিনি কোনও গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না বলেই বোধহয় তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার সাহিত্যসমাজ নিস্তরঙ্গ ছিল। তবে ‘নারীজগৎ’ পত্রিকার তরফে অবশ্য একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল।

## Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, অরুণা, ‘বাণী রায় ও তাঁর সাহিত্য’, নারী জগৎ পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃ. ১
২. দেবসেন, নবনীতা, ‘বাণী পিসিমা’, একান্তর পত্রিকা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৬২
৩. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র, বাণী রায়ের রচনা প্রসঙ্গে, একান্তর, জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৫৯
৪. রায়, রথীন্দ্রনাথ, ভূমিকা অংশ, প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ, কলকাতা, রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫
৫. রায়, বাণী, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, ভূমিকা অংশ, কলকাতা, মুখার্জী বুক হাউস, ১৯৫৮
৬. রায়, বাণী, হাসিকান্নার দিন ও অন্যান্য গল্প, মুখবন্ধ, কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০